Tuesday, November 12, 2024

সর্বজনকথা

আনু মুহাম্মদ সম্পাদিত রাজনীতি, অর্থনীতি, সমাজ বিশ্লেষণমূলক সংকলন

সর্বজনকথা

৪১তম বর্ষ, ১ম সংখ্যা

গণঅভ্যুত্থানের দিনরাত্রি: একজন অংশগ্রহণকারী শিক্ষার্থীর অভিজ্ঞতা

আসিফ রহমান

গুলিবিদ্ধ অবস্থায় এভাবেই হাসপাতালে নিয়ে যেতে হয়েছিল একাদশ শ্রেণীর ছাত্র শহীদ গোলাম নাফিজকে। ছবি: জীবন আহমেদ।

কোটা সংস্কারের আন্দোলন থেকে জুলাই গণঅভ্যুত্থান, এই যাত্রাপথে কীভাবে শিক্ষার্থীসহ দেশের মানুষের মনোজগত পরিবর্তন হল, গণঅভ্যুত্থান আসলে কীরূপ নিল, কীভাবে সেটিতে মানুষ জড়িয়ে গেল, কীভাবে কত মানুষ, নারী-পুরুষ-শিশু-বৃদ্ধ কারো কোন ডাকের অপেক্ষায় না থেকে কত বিচিত্রভাবে তাতে অংশ নিল,

তাদের মধ্যে সংহতি কীভাবে গড়ে উঠল, কতরকম ট্রমার মধ্যে দিয়ে তাদের যেতে হল – সেইসব অমূল্য অভিজ্ঞতাই একজন প্রত্যক্ষ অংশগ্রহণকারী শিক্ষার্থীর জবানে উঠে এসেছে এই লেখায়।

আমি রাজধানীর সরকারি তিতুমীর কলেজের অর্থনীতি বিভাগের ২০-২১ সেশনের একজন ছাত্র। ক্যাম্পাসে যাওয়া, বন্ধুদের সাথে আড্ডা, এভাবেই দিন যাচ্ছিল। আর বাকি ছাত্রদের মতোই ওয়েব সিরিজ বা নিজেদের দৈনন্দিন জীবন নিয়ে লোচনাই ছিলো আমাদের মুখ্য কাজ। তবে একদিন মহাখালীতে ওয়ারলেসে আমরা যে দোকানে আড্ডা দেই সেখানে মার এক বন্ধু নাইম বলে "যা-ও চাকরি-বাকরির আশা ছিলো ছেলেপেলের, তাও এবার গেল, কোটা ব্যাক আসতেছে তাও ৬%, আমরা এবার ঘাস কাটি।" ওর কথা শুনে এক প্রকার তাচ্ছিল্যের সুরেই বললাম, "আমার কি বাল! আমি বিসিএসও বো না সরকারি চাকরি করারও ইচ্ছা নাই।" তখন নাইম বললো রাফাত এর কি হবে? রাফাত আমার ডিপার্টমেন্টের নিয়র। সহজ সরল একটা ছেলে, যার জীবনের একমাত্র লক্ষ্য-উদ্দেশ্য বিসিএস। তখন ভাবলাম, রাফাতের মতো কত ছেলে ছে যাদের জীবনের লক্ষ্য বিসিএস বা সরকারি চাকরি। তারা জানপ্রাণ দিয়ে লেখাপড়া করছিল এই সরকারি চাকরির আশায়। এখন এই ৫৬% কোটা হলে এরা তো সুইসাইড করবে।

এসব আলোচনা করলাম কিন্তু এত ভাবলাম না। আমার চিন্তা হল – ভাই আমার সরকারি চাকরি দরকার নাই, এসব আমার বে কি হবে! পরে বাসায় ফিরলাম, ফিরে আপুর সাথে এ বিষয় নিয়ে বলছিলাম যে আমার তো চিন্তা ভাবনা নেই এ নিয়ে, কিন্তু যারা এই সরকারি চাকরিকেই নিজের জীবনের লক্ষ্য ভাবে তারা এটা কীভাবে নিবে? আর তার থেকে বড় ব্যাপার যেটা আমার কাছে ছিলো তা এই মুক্তিযোদ্ধা কোটা। কারণ নিজের এলাকা থেকেই দেখেছি আওয়ামী লীগ যারা করে নাই তাদের মুক্তিযোদ্ধা কোটা নাই। এলাকার মুরব্বিদের থেকে জানতে পারি তারা মুক্তিযোদ্ধা, কিন্তু তাদের কোটা নাই। আবার অনেকের কথা শুনেছি, যারা শুধু আওয়ামী লীগ করার জন্য মুক্তিযোদ্ধা কোটা পেয়েছে। আর একটা ভাবার বিষয় যেটা ছিলো – মুক্তিযোদ্ধা কোটা পাবে এটা ঠিক আছে, তার ছেলে মেয়ে পাবে – এটাকেও মেনে নিলাম যে তাদের বাবা/মা যুদ্ধে গেছেন, তাদের জীবনে একটা বড় ইফেক্ট পড়েছে। কিন্তু নাতিপুতি কিসের ভিত্তিতে কোটা পায়? এর উত্তর একটাই আসে যে হাসিনা নিজের দলের লোকদের সরকারি চাকরিতে বসাতে চাচ্ছে। যদিও বুদ্ধি হবার পর থেকে দেখেই আসছি যে আওয়ামী লীগ না করলে সরকারি চাকরি পাওয়া প্রায় অসম্ভব হয়ে গেছে। তখন মনে মনে ক্ষোভের সৃষ্টি হলো। মনে হল, আমার এই বন্ধু-ভাই-ব্রাদার যারা আছে, যাদের স্বপ্ন সরকারি চাকরি তাদের জন্য হলেও আমার আন্দোলনে যাওয়া উচিৎ।

এটা ভাবলাম কিন্তু যাওয়া হয়ে উঠলো না। এর মাঝে বিদেশ সফর সেরে প্রধানমন্ত্রী দেশে ফিরলো। বরাবরের মতোই চায়ের দোকানে আড্ডা দিচ্ছি, তখন চায়ের দোকানদার মামা বলতেছে, "কতবড় হারামি দেখছেন? একে তো কোটা দিয়ে সব নিজের লোক ঢোকাবে, আবার ছাত্রদের বলছে রাজাকারের বাচ্চা?" ঘটনা কি জানতে ফেসবুকে ঢুকলাম। তখন দেখলাম শেখ হাসিনা কীভাবে বলে দিলো, "মুক্তিযোদ্ধার নাতিপুতিরা কোটা পাবে না তো কি রাজাকারের নাতিপুতিরা পাবে?"। ছাত্ররা আন্দোলন করছে একটা নৈতিক দাবিতে। কোথায় একটা সল্যুশনের দিকে যাবে তা না, সে ডিরেক্ট ছাত্রদের রাজাকার বলতেও দ্বিধা করলো না! এই কথাটা গায়ে ব্যাপকভাবে লাগলো। ছোট থেকে প্রবল ঘৃণার চোখে যেই রাজাকারদের দেখলাম, আর আজ ছাত্রদের রাজাকার বলে এই ছাত্রদের বিশ্রীরকম অপমান করলো! অপমানটা গায়ে বেশ ভালোভাবে লাগলো। ইচ্ছা করছিলো তখনই কিছু একটা করি। এটা নিয়ে কয়েকজন বন্ধুর সাথে কথা বললাম যে এভাবে চুপ থাকা যায় না, কিছু করা উচিৎ।

এর মধ্যে ফেসবুকে শুরু হলো ছাত্রলীগদের সুশীল রুপধারী কিছু ছাত্রদের সাথে তর্ক, তর্কে না জিততে পেরে তখন হুমকি দেয়, "রাস্তায় নামিস, দেখে নিবো। " কিছু না ভেবে বাসায় আসলাম। তারপর ফেসবুকে স্ক্রল করে দেখি ঢাবিতে ছাত্রছাত্রীরা হলের তালা ভেঙ্গে বেড়িয়ে এসেছে মিছিলে, আর স্লোগান হচ্ছে, "তুমি কে? আমি কে? রাজাকার! রাজাকার! কে বলেছে? কে বলেছে? স্বৈরাচার! স্বৈরাচার!" স্লোগানটা ঠিক যেন হাসিনার গালে থাপ্পড়ের সমতুল্য। ফেসবুক জুড়ে শুরু হলো আলোচনা। সবাই ছাত্রদের সাহসী পদক্ষেপকে সাধুবাদ জানালো। আর তখন ছাত্রলীগ এর ব্যাচমেটরা দেখি লিখতে থাকলো – মেধাবী খনো নিজেকে রাজাকার বলতে পারতো না। অথচ রাজাকার নামটা তাদের নেত্রী-ই দিয়েছিলো আমাদের। পরে নিউজে দেখি আন্দোলন চলছে বরাবরের মতোই, হতাশ হয়ে এক প্রকার ধরে নিয়েছিলাম যে হাসিনা যা বলবে তাই করবে, দেশের নগণ হিসেবে আমরা তুচ্ছ।

রপর দেখতে পেলাম শিক্ষামন্ত্রীর পোস্ট লীগের লোকজন শেয়ার দিচ্ছে, সেখানে লিখেছে, "তোরা যারা রাজাকার এই মুহূর্তে বাংলা ছাড়", এদিকে ওবায়দুল কাদের বললো আন্দোলনকারীদের রুখতে ছাত্রলীগই যথেষ্ট। তখনও ভেবেছিলাম, "লীগের লাপানও তো অনেকে আন্দোলনে আছে, কারণ এই কোটার জাঁতাকলে তাদের স্বপ্নও তো নষ্ট হচ্ছে"। কিন্তু পরের দিন যা খতে পেলাম সেটা দেখবো তা আগে ভাবি নাই। ১৫ তারিখ বাইরে থেকে গুন্ডা ভাড়া করে ঢাবিতে আন্দোলনরত ক্ষার্থীদের ওপর যে হামলা হলো তা নজিরবিহীন। সবার মতো আমার ফেসবুক টাইমলাইনেও স্কুল পড়ুয়া মেয়ের রক্তাক্ত বি আর লীগের পৈশাচিক হামলার ভিডিও ঘুরতে থাকলো। সেকেন্ডের মধ্যে লীগের প্রতি ঘৃণাটা এত পরিমাণ বেড়ে গেল যতটা ঘৃণা এর আগে হয়তো কাউকে করি নাই। তখন লীগ করা আমার ২টা বন্ধু ছিলো, ফেসবুকে ওদের সাথে ঝগড়া লাগলো গ্রুপে। ওরাও একমত হল যে হামলা করাকে ওরা সমর্থন করে না। কিন্তু লীগ তো লীগ-ই! পা চাটতে চাটতে ওরা ওদের ব্যাক্তিত্ব গায়েব করে ফেলছিলো। কিন্তু এর মধ্যে অনেকেই হল ছেড়ে দিলো। কেননা হলে থেকে লীগের বিরুদ্ধে কিছু করতে পারবে না। তখন আমাদের ক্লোজ ফ্রেন্ডদের যে গ্রুপ ছিলো সেখানে আমার এক বন্ধু বললো, "তুই না শৈলকুপার ছেলে? এখনও কি চুপ থাকা সাজে?" কিছু ফ্রেন্ড ছিলো চাকরির কারণে যেতে পারলো না। কিন্তু আমরা ঠিক করলাম আমরা যাব কাল ঢাবিতে। মাইর যখন খাইছি আন্দোলন সফল করবোই।

১৮ জুলাই মালিবাগ মৌচাক অবরোধ, ছবি: মাহতাব উদ্দীন আহমেদ

প্রথমে ডিপার্টমেন্টের গ্রুপে আলোচনা করলাম যে আমরা আন্দোলনে যোগ দিবো। কিছুক্ষণের মধ্যেই খবর পেলাম আমাদের কনভারসেশনের স্ক্রিনশট বড় ভাইদের কাছে চলে গেছে। লীগের পরিচিতরা সতর্ক করলো, "মামা, তোদের নামে রিপোর্ট যাচ্ছে, এসব বাদ দে। এমনি ঠান্ডা হয়ে যাবে।" জবাব দিলাম, "তোর ভাই বোনকে মারার পর তুইও কি এটা ভেবেই চুপ থাকতি?" এর জবাব দিতে পারে নাই। তারপর এক বন্ধু ক্যাম্পাসের বৈষম্যবিরোধী ছাত্র আন্দোলনের গ্রুপে এড দিলো। সেখানে দেখলাম নুরুদ্দিন জিসান নামে এক ছাত্রদল নেতা নেতৃত্ব দিচ্ছে। মহাখালীতে আন্দোলনের কথা হলো – ঢাকা ময়মনসিংহ রোড ব্লকেড হবে। তবে আমার মাথার মধ্যে ঘুরছিলো শুধু ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের হামলা। ডিসিশন নিয়ে ফেললাম আমি ঢাবিতেই যাবো। কারণ ছাত্রলীগ ঘোষণা দিলো ঢাবিতে আবারও তারা হামলা করবে। আর মাথায় এটাই ঘুরছিলো যদি আমি ওখানে থাকি, তাহলে মরলেও একটা ছাত্রলীগ মেরে মরবো। তখনই আমার বন্ধু নাইম বললো, "কাল ঢাবিতে যাবি?" বললাম, "হ্যাঁ, এটাই ভাবতেছি আমি।" তখন ও বললো, "ঠিক আছে আমি আরো কয়েকজনকে বলি, একসাথে ঢাবিতে যাব।" বললাম ঠিক আছে। রাতে সিদ্ধান্ত নিলাম কিন্তু সারারাতে আর ঘুমাতে পারলাম না। এত মানুষের আর্তনাদ আর ভিডিওগুলো মাথার মধ্যে ঘুরতে লাগলো।

> *শাহবাগ থেকে টিএসসি যাবার পথে দেখলাম "জয় বাংলা" স্লোগান দিতে দিতে ট্রাক ভরে ভরে লোক আসছে আর অস্ত্র নামাচ্ছে। প্রতিটা দেশি অস্ত্র, একদম নতুন ছিল, কাছ থেকে দেখলাম – রামদা, চাপাতি। ওখানে ছাত্র প্রায় ছিলো না বললেই চলে। শুধু আশপাশের কলেজের ছাত্রলীগ আর বেশীর ভাগই ছিলো ভাড়াটে, কিশোর গ্যাং এর ছেলেপেলে।*

১৬ তারিখ সকালে ক্যাম্পাসের বৈষম্যবিরোধী ছাত্র আন্দোলনের গ্রুপে দেখলাম মহাখালী আমতলীতে আন্দোলন করা হবে। কিন্তু আমার মনে এটাই ছিলো যেখানে হামলা হবে আমি সেখানেই যাবো। আর হামলার বদলা নিবো। গ্রুপে একটা মেসেজ দিলাম যে ভাই ঢাবিতে আজও হামলা হতে পারে, আমি ঢাবিতে যেতে চাই। তখন আমার বন্ধু নাইম আমারে বললো সেও ...মার সাথে ঢাবিতে যাবো। আমি বনশ্রী থেকে ডিরেক্ট শাহবাগ গেলাম আর নাইমের সাথে আমার ব্যাচের আরো ৩ জন ...সলো শাহবাগ। শাহবাগ থেকে টিএসসি যাবার পথে দেখলাম "জয় বাংলা" স্লোগান দিতে দিতে ট্রাক ভরে ভরে লোক ...সছে আর অস্ত্র নামাচ্ছে। প্রতিটা দেশি অস্ত্র, একদম নতুন ছিল, কাছ থেকে দেখলাম – রামদা, চাপাতি। ওখানে ছাত্র প্রায় ...লো না বললেই চলো। শুধু আশপাশের কলেজের ছাত্রলীগ আর বেশীর ভাগই ছিলো ভাড়াটে, কিশোর গ্যাং এর ছেলেপেলো। ...ান্দোলনকারী শিক্ষার্থীদের থাকার কথা ছিলো শহীদ মিনারে। সেদিকে যাবো, তখন দেখি আমার কলেজের ছাত্রলীগের ...তারা অস্ত্র হাতে দাঁড়িয়ে আছো। ওরা চিনে ফেলবে, তাই অন্য পথ দিয়ে ঘুরে আগালাম। তখন আন্দোলনকারী শিক্ষার্থীর সংখ্যা তুলনামূলক কম। পুলিশ আর ছাত্রলীগের পাহারা পার করে ওখানে আসাও কঠিন ছিলো। পরে আন্দোলনকারীদের ...থে মিশে রাস্তায় ব্যারিকেড দিলাম, আর নিজেদের কাছে যেহেতু কোন অস্ত্র ছিলো না তাই ইট গোছানো হলো। তখন ভাবছিলাম – আজ হয়তো মরবো, না হয় হাত পা হারাবো, তবে যদি মরি অন্তত একজন লীগ মেরেই মরবো। কিন্তু তারপর ...নের আখরার দিক থেকে লোকাল লোকজন আসলো। বললো "মামা আমরা আপনাদের সাথে আছি, যা হয় দেখা যাবো।"

টিএসসিতে সাদ্দাম (ছাত্রলীগ সভাপতি) ভাষণ দিচ্ছে আর আমরা কার্জন হলের রাস্তায় অপেক্ষা করছি কখন ওরা আক্রমণ করবো। কিন্তু কিছুক্ষণ পর লীগের লোকজন কেমন শান্ত হয়ে গেল। বুঝলাম ওরা আজ আর হামলা করার সাহস পাচ্ছে না। তখন আমার বন্ধু নুরুল ফোন দিলো যে ব্র্যাকের সামনে ওরা আসছে, ঝামেলা হতে পারো। তখন ভাবলাম, আলাদা হয়ে আন্দোলন করার থেকে বন্ধুদের সাথে গিয়ে করি। নাইমও একমত হলো আমরা মেট্রো ধরে কারওয়ান বাজার এসে সিএনজি নিয়ে ব্র্যাকে আসি, কিন্তু এসে দেখি প্রোগ্রাম শেষ। আরেক বন্ধু ইউসুফকে কল দেই, ও বলে ব্র্যাকের প্রোগ্রাম শেষ। ওরা বাসায় চলে গেছো। ঠিক তখনই একটা সিগারেট জ্বালিয়ে ফেসবুকে ঢুকি আর দেখি মহাখালীতে মারামারি লেগেছে, পুলিশ আর লীগ অ্যাটাক করেছে। সিগারেট ফেলে নাইমকে বললাম, চল। কিন্তু মারামারির কারণে পুরো রাস্তা বন্ধ। আমরা দুজন দৌঁড়িয়ে বাড্ডা থেকে মহাখালী পৌঁছে যাই। তখন ওখানকার দোকানদার মামারা বলে, "কলেজের দিকে যাইয়েন না, লীগ ওদিকে"। তখন এক এক গলি ধরে রেললাইনে আমার বন্ধুদের কাছে পৌঁছাই। কিন্তু তখন এত পরিমাণ গুলি করছিলো পুলিশ যে ফাঁকা জায়গায় দাঁড়ানো সম্ভব না। ফাঁকা জায়গা থেকে আমরা পাথর মারলে পুলিশ করছে গুলি। বাধ্য হয়ে আমরা কাঁচাবাজারের মধ্যে আশ্রয় নেই।

মহাখালী কাঁচাবাজার মসজিদের সামনে বিশ্রাম নিচ্ছি, এমন সময় একটা শব্দ আর একটা দোকানের ছাদে এসে পরলো টিয়ারশেল। তখন ব্যাপক রাগ হলো যে আমাদের ওপর গুলি করলো ঠিক আছে, বাজারের মধ্যে সাধারণ মানুষ, বাচ্চা, বুড়া সবাই আছে, এর মধ্যে টিয়ারশেল মারে কীভাবে! একটা বাচ্চা চোখ ধরে টিয়ারশেলের ধোঁয়ায় ছটফট করতে লাগলো, আমরা ছাত্ররা তখন সবাইকে সরাতে ব্যাস্ত। এদিকে চোখ থেকে শরীর পর্যন্ত মরিচ লাগার মতো জ্বলতেছে, চোখ দিয়ে অনবরত পানি পড়ছে। আরো বিপদ যেটা হলো, অনেকের টিয়ারশেলের ব্যাপারে ধারণা নেই, তারা পানি খুঁজছে, পানি লাগাচ্ছে চোখে আর আরো ছটফট করছে। এভাবে আরো কিছু টিয়ারশেল পরলো। তখন মসজিদ থেকে বের হয়ে মসজিদের ইমাম আগুন

জ্বালালো রাস্তার ওপর। আরো কিছু লোকাল মানুষ এসে তাদের দোকানে কাগজের যা আছে দিলো যে ভাই আগুন জ্বালান। আমি আগুন জ্বালালাম, সবাই এসে আগুনের তাপ নিতে লাগলো।

১৮ জুলাই মৌচাক মোড়, ছবি: মাহতাব উদ্দীন আহমেদ

এর মধ্যে আরেক ঘটনা ঘটে। আমাদের কয়েকজনের দিকে লীগের কিছু ছেলে রামদা নিয়ে হামলা চালাতে আসলে, যখন তারা প্রায় কোপ দিয়ে বসবে তখন ঘটনাচক্রে সেখানে উপস্থিত এক ব্যক্তি নিজের জীবনের ঝুঁকি নিয়ে তাদেরকে শাসায় যে আমাদেরকে যদি কোপ দেয়া হয়, তাহলে তারা কেউ চুপ বসে থাকবে না, তারাও পাল্টা হামলা চালাবেন। তখন সেই লীগের ছেলেগুলো পরিস্থিতি দেখে চলে যায়। আমরাও তখন বাজারের পিছন দিক দিয়ে বের হয়ে যাওয়ার চেষ্টা করি। বাজারের পিছন দিক দিয়ে বের হওয়ার সময় আবারও লীগের গুণ্ডারা আমাদের উপর হামলা চালায়। এসময় তিতুমীর কলেজ ছাত্রলীগের এক ছেলে রামদা উঁচিয়ে আমাদের দিকে তেড়ে আসে। সে তার রামদা দিয়ে কোপ দেয় কিন্তু আমার সাথে থাকা বন্ধু তাকে লাথি দিয়ে মাটিতে ফেলে দেয়, ফলে সেই কোপ আমাদের গায়ে লাগেনি। এরপর আমি গিয়ে তার রামদা ধরা হাতটি পা দিয়ে চেপে ধরে তাকে খালি হাতে পাল্টা মার দেই এবং এরপর আমার বন্ধুসহ সেখান থেকে চলে যাই। সেদিনের মতো বাসায় ফিরে আসি ক্লান্ত শরীর নিয়ে।

রাতে ফেসবুকে প্রচারণা চালাচ্ছি, তখন আবু রংপুরে আবু সাইদের হত্যার ভিডিওটা সামনে আসে। এটা দেখার পরেই সবার রাগ অন্য পর্যায়ে চলে যায়। নিরস্ত্র মানুষকে গুলি করে মারা আমরা কেউই সহ্য করতে পারি নাই। শরীর যেমনই হোক পরের দিন আন্দোলনে যাবই ঠিক করি। যথারীতি এত কিছুর মধ্যে খাবার খাওয়া ভুলে গেছিলাম। ভবিষ্যতে কি হবে জানতাম না, শুধু জানতাম আন্দোলন থামানো যাবে না। হেরে যাওয়া যাবে না। এর মধ্যে আমার এক বন্ধু এনাম আমাকে কল দিয়ে বলে সাকিবের খবর জানিস? আমি বললাম না তো। আমি কিছু জানতামই না কি হয়েছে। তখন জানতে পারলাম ক্যাম্পাস থেকে

আমাদেরই ব্যাচের লীগের নামকরা গুন্ডা সোহাগ তার লোকজন নিয়ে এসে ওকে রাস্তায় ফেলে মেরেছে। পরে নিউজেও দেখলাম। অবাক হলাম এ কারণে যে সাকিবের বাবা অসুস্থ, ও সেই কাজে ব্যস্ত, ও তো আন্দোলনেও থাকেনি, তাহলে ওকে কেন মারলো? ওকে মারার কারণ দেখিয়েছে আন্দোলনের পক্ষে ফেসবুকে পোস্ট করা। তারপর সাকিবকে কল দিলাম ও আফসোস করে বললো যে আমি ভাবিও নাই আমাকে কেউ এভাবে মারবে। ওকে সোহাগ ডেকেছে, ও নিজের ব্যাচমেট দেখে চা খাওয়ার কথা বলেছে, তখন লোকজন নিয়ে এসে ওকে গুলশান মহাখালী রাস্তার ওপর ফেলে ২০/২২ জন মিলে মেরেছে। মুখের পাশে রক্ত জমে গিয়েছিলো আর ওর পুরো শরীরে মারের দাগ ।

> “
>
> *ভবিষ্যতে কি হবে জানতাম না, শুধু জানতাম আন্দোলন থামানো যাবে না। হেরে যাওয়া যাবে না। এর মধ্যে আমার এক বন্ধু এনাম আমাকে কল দিয়ে বলে সাকিবের খবর জানিস? আমি বললাম না তো। আমি কিছু জানতামই না কি হয়েছে। তখন জানতে পারলাম ক্যাম্পাস থেকে আমাদেরই ব্যাচের লীগের নামকরা গুন্ডা সোহাগ তার লোকজন নিয়ে এসে ওকে রাস্তায় ফেলে মেরেছে।*

রাতে আমার আরেক বন্ধু জিপানের সাথে কথা হয় যে কালকে কি করবো। আমি আর জিপান ক্যাম্পাসে ডিপার্টমেন্টের টিমে ফুটবল খেলতাম তাই নিজেদের ওপর নিজেদের একটা আলাদা ভরসা ছিলো। আমি ঠিক করলাম ১৭ তারিখ আমি আগেই মহাখালী চলে আসবো, ক্যাম্পাসের সবার সাথে যোগ দিবো। রাতে খেতে পারলাম না, ঘুমও ঠিকঠাক হলো না। শরীর অনেক খারাপ হতে লাগলো বুঝলাম জ্বর আসছে। ঘুম আসতে আসতে ৪টা বেজে গেল। ঘুমও ভাঙ্গলো দেরীতে। ঘুম থেকে উঠে সকালের খাবার খেয়ে বাসা থেকে বের হলাম, রামপুরা এসে দেখলাম ইস্ট ওয়েস্ট ইউনিভার্সিটির ছেলেমেয়েরা প্রটেস্ট করছে। তাদের সাথে যোগ দিলাম। পরে মহাখালী আসি। বাংলা ব্লকেড চলছিলো, আন্দোলন ভালোভাবেই হয় সেদিন, শরীর খারাপ থাকার কারণে দ্রুতই বাসায় ফিরে আসি। ফিরে আসার পর জানতে পারলাম আমি চলে আসার পর মহাখালীতে পুলিশবক্স পুড়িয়ে দেওয়া হয়েছে। আর পুরো দেশেই মোটামুটি সংঘর্ষ চলছে। ঠিক করলাম পরের দিন যেভাবেই হোক আমাকে থাকতে হবে। মেসেঞ্জার গ্রুপে আন্দোলনকারীদের সাথে কথা হল, ১৮ তারিখও মহাখালী আমতলীতে সমবেত হব, আমাদের সাথে শাহীন কলেজের ছাত্ররাও থাকবে।

১৮ তারিখ ঘুম থেকে উঠেই বুঝলাম শরীর বেশ খারাপ। খাবার খাচ্ছি, তখন ফেসবুকে দেখলাম ব্র্যাকের স্টুডেন্টদের ওপর পুলিশের হামলা, অনেকে গুলিবিদ্ধ। ব্র্যাকের ক্যাম্পাসের হসপিটালে জায়গা না থাকায় বনশ্রীতে ফরাজি হাসপাতালে আহতদের পাঠানো হয়। কিন্তু ফরাজি হাসপাতাল কর্তৃপক্ষ শিক্ষার্থীদের চিকিৎসা করতে রাজি হয় না। তখন আমি ওষুধ খেয়ে নিচে নামি। বনশ্রীর মানুষের চাপে পরবর্তীতে ফরাজি হাসপাতাল চিকিৎসা দিতে বাধ্য হয়। আমি রিকশা নিয়ে দ্রুত ব্র্যাকের সামনে যাওয়ার চেষ্টা করি। রিকশাওয়ালা মামা বলেন, “রামপুরা ব্রীজে পুলিশ, আপনি টিভি সেন্টার নামেন।” টিভি সেন্টারে নামিয়ে রিকশাওয়ালা মামা ভাড়া পর্যন্ত নেয় নাই! বললেন, “মামা, আমরা আপনাদের সাথে আছি টাকা লাগবে না, আপনারা এগিয়ে যান!”

দৌড়ে রামপুরা মেইন রাস্তায় যাইতেই দেখি একের পর এক গুলি। প্রথমত টিয়ারশেলের বৃষ্টি, সাথে ছররা গুলি। ছররা গুলির টুকরাগুলো একের পর এক দেওয়ালে লাগছে, এদিকে সুযোগ পেলেই আমরা ইট ছুঁড়ছি। রামপুরা মেইন রাস্তায় পুলিশ, আর প্রতিটা গলির মাথায় ছাত্ররা আর সাধারণ মানুষ। পুলিশ গুলি করে, আমরা গলির ভেতর ঢুকি, আবার বের হই, ইট মারি। এভাবে ১ ঘন্টা চললো। এরপর পুলিশ শুরু করলো ডিরেক্ট বুলেট মারা। একদম কান ঘেঁষে একটা গিয়ে লাগলো পাশের দেওয়ালে। নিশ্চিত হলাম এটা লাগলে একবারেই মৃত্যু অবধারিত ছিল। কিন্তু বুলেট দেখে ভয়ের বদলে রাগ বেড়ে গেল, আমাদের টাকায় কেনা গুলি আমাদের ওপরই করছে! এভাবে প্রায় ২ ঘন্টা পুলিশ মুষলধারে গুলি চালিয়েছে, আমরাও ইট মেরেছি।

> *দৌড়ে রামপুরা মেইন রাস্তায় যাইতেই দেখি একের পর এক গুলি। প্রথমত টিয়ারশেলের বৃষ্টি, সাথে ছররা গুলি। ছররা গুলির টুকরাগুলো একের পর এক দেওয়ালে লাগছে, এদিকে সুযোগ পেলেই আমরা ইট ছুঁড়ছি। রামপুরা মেইন রাস্তায় পুলিশ, আর প্রতিটা গলির মাথায় ছাত্ররা আর সাধারণ মানুষ। পুলিশ গুলি করে, আমরা গলির ভেতর ঢুকি, আবার বের হই, ইট মারি।*

এক সময় আমাদের ইট শেষ, পুলিশের গুলি শেষ হয় না। এরপর বুঝলাম ইট লাগবে। লোকাল বাচ্চা বাচ্চা ছেলেরা ছুটলো ইট খুঁজতে। তখন দেখলাম পাশেই একটা ওয়েল্ডিং এর দোকান। আর ইট মারতে না পারলে পুলিশ এগিয়ে আসবে, আমাদের পিছিয়ে যেতে হবে, আমরা হেরে যাবো। দোকান থেকে একটা হাতুড়ি নিয়ে একটা দেওয়ালের এক কোনা ভাঙি, সেটা দিয়ে ইট বানাই। ব্র্যাকের কিছু মেয়ে ছিলো আমাদের সাথে। ওরাসহ ইট একটা বস্তায় ভরে আবার রাস্তার পাশে নিয়ে গেলাম। জ্বর নিয়ে একদিকে টিয়ারশেলের ধোঁয়া আর রোদ, আরেকদিকে পুলিশের অনবরত গুলি। আমাদের কাছে সুবিধা ছিল গলিতে আশ্রয় নেওয়ার জায়গা ছিল, সাথে রাস্তার পুলিশের ব্যারিকেডগুলোকেই আমাদের ঢাল হিসেবে কাজে লাগিয়েছিলাম। তখন হঠাৎ একজন বয়স্ক লোক বলে উঠলো, "আচ্ছা পুলিশ তো তাদের গাড়ি থেকে এত দূরে, তাহলে পুলিশ এত গুলি পাচ্ছে কোথায়?" ব্যাপারটা আমিও ভাবলাম। রাস্তায় কোন গাড়ি নাই, পুলিশ যত গুলি করেছে খালি হাতে তা ক্যারি করা সম্ভব না। রাস্তায় যাচ্ছে শুধু অ্যাম্বুলেন্স, যেগুলো হাতিরঝিলের সাইডে দাঁড়াচ্ছে, আর সেগুলোতে পুলিশ কি যেন চেক করছে। হুট করে বলে বসলাম, "এম্বুলেন্স চেক করো তো!" প্রথম একটা অ্যাম্বুলেন্স থামানো হলো, ভেতরে গুলিবিদ্ধ ছাত্র। এরপর এক অ্যাম্বুলেন্স আটকানো হলো সেটার মধ্যে ছিলো এক আহত পুলিশ, মাথায় ইট লাগা। উত্তেজিত কিছু রিকশাচালক বললো, "শুয়োরের বাচ্চারে মাইরা ফেলবো। " তখন আমিসহ ব্র্যাকের কিছু ছাত্র বললাম, "না ভাই আমরা ছাত্র। আমরা পুলিশ বা আওয়ামী লীগ না, ছেড়ে দেন।" এরপর যে অ্যাম্বুলেন্সটাকে আমরা আটকালাম সেটা দেখে রাগ আরও বেড়ে গেল। অ্যাম্বুলেন্স এর পেছনে ভর্তি ছিলো টিয়ারশেল, ছররাগুলি আর বুলেট দিয়ে! আমরা কিছু বুঝে ওঠার আগেই অ্যাম্বুলেন্স চালক দৌঁড়ে পালাল। স্থানীয় মানুষও তখন অ্যাম্বুলেন্স ঘিরে রেখেছেন। তখন আমি গলিতে ফিরে এসে ফেসবুকে একটা পোস্ট করি যে, "অ্যাম্বুলেন্স চেক করে ছাইড়েন, পুলিশ অ্যাম্বুলেন্সে গুলি নিয়ে আসছে"। পরে ফিরে আবারও ওই আটকানো অ্যাম্বুলেন্সের

কাছে গিয়ে দেখি অ্যাম্বুলেন্স পুরো ফাঁকা! স্থানীয়দের কাছে শুনলাম, ওই গুলিবৃষ্টির মধ্যে ওই অ্যাম্বুলেন্সের গুলিগুলোকে কে কোথায় সরিয়ে নিয়েছে সেটা কেউই সঠিক বলতে পারছেন না।

> “
>
> *এরপর যে অ্যাম্বুলেন্সটাকে আমরা আটকালাম সেটা দেখে রাগ আরও বেড়ে গেল। অ্যাম্বুলেন্স এর পেছনে ভর্তি ছিলো টিয়ারশেল, ছররাগুলি আর বুলেট দিয়ে। আমরা কিছু বুঝে ওঠার আগেই অ্যাম্বুলেন্স চালক দৌঁড়ে পালাল। স্থানীয় মানুষও তখন অ্যাম্বুলেন্স ঘিরে রেখেছেন। তখন আমি গলিতে ফিরে এসে ফেসবুকে একটা পোস্ট করি যে, “অ্যাম্বুলেন্স চেক করে ছাইড়েন, পুলিশ অ্যাম্বুলেন্সে গুলি নিয়ে আসছে”।*

যাই হোক, ধীরে ধীরে পুলিশের গুলি শেষ হতে লাগলো, এবার তারা কিছুক্ষণ পর পর গুলি ছুড়ছিলো। এর মধ্যে এক পুলিশ ।কার মতো বলে উঠলো “স্যার গুলি তো শেষ, গুলি আনেন”। এইটা শুনতেই সবাই চিৎকার দিয়ে উঠল, “গুলি শেষ! ধর ওদের!” মুহুর্তেই দেখতে দেখতে রাস্তায় হাজার হাজার লোক হয়ে গেল! ২টা পুলিশ গণপিটুনি খেল, মানুষের ভীড়ে এমন অবস্থা যে ওখানে কি হচ্ছে দেখতেই পাচ্ছিলাম না। এদিকে অনেক ছাত্র গুলি খেয়েছিল, তাদের অ্যাম্বুলেন্সে পাঠানো হচ্ছিল হাসপাতালগুলোতে। এসময় একটা পুলিশকে ভয়ানক গণপিটুনির মধ্যে পড়তে দেখে নিজেদের খারাপ লাগলো। সবাইকে বললাম, “ভাই আর মাইরেন না। ” পরে সবাই বললো ছেড়ে দেওয়া হবে, তবে ওর ইউনিফর্ম ছেড়ে যেতে হবে। পুলিশ তাই করলো, ওকে ছেড়ে দেওয়া হলো। এরপর কয়েকজন উত্তেজিত মুরব্বি গোছের মানুষকে দেখলাম বিটিভি সেন্টারকে দেখিয়ে বলছেন, “এই বাতাবী লেবু কোন কাজের না, এইটা ভাঙ!” আমরা ছাত্ররা আটকালাম যে কাকা এইটা দেশের সম্পদ এটা ভেঙে কোন লাভ নাই। আজ এদের, কাল এরা অন্যদের। কিন্তু তখনই বিটিভি সেন্টারের ভেতর থেকে কোন এক পুলিশ গুলি চালায়। তারপর আর কিছুই ছাত্রছাত্রীদের হাতে ছিলো না। উত্তেজিত জনতা বিটিভি এর গেট ভেঙ্গে ভেতরে ঢোকে, আর বিটিভির যেই গাড়িগুলো ছিলো সেটাতে আগুন দেয়। আমি আর আমার বন্ধু জিপান দূর থেকে দেখলাম। তখন আমার শরীর এতটাই ক্লান্ত আর বিধ্বস্ত যে আমার পক্ষে আর দাঁড়িয়ে থাকা সম্ভব হচ্ছিলো না। জ্বরও বাড়লো, আমি বন্ধু জিপানকে বলে রিক্সা নিয়ে বাসায় চলে আসি।

১৯ জুলাই বনশ্রী জি ব্লক মেইন রোড, ছবি: মাহতাব উদ্দীন আহমেদ

বাসায় এসে সব জায়গায় হাসিনার তাবেদাঁর পুলিশের হার, জনগণের জয় দেখে একটু শান্তি পাচ্ছিলাম। তখন গ্রাম থেকে একজন কল দিয়ে বলল, "সাব্বির মারা গেছে এটা কি সত্যি?" সাব্বির আমার গ্রামের ছেলে, স্কুলে আমার জুনিয়র ছিলো, উত্তরাতে কাজ করতো আমি জানি। তখন আমি সাব্বিরের রুমমেটকে কল দেই। ও কল ধরেই বলে, "ভাই সাব্বির আর নাই! গলায় গুলি লাগছিলো হাসপাতালে নেওয়ার আগেই মারা গেছে।" সাব্বিরকে চিনতাম গ্রামের একটা ভদ্র ছেলে হিসেবে। কারো সাথে গ্যাঞ্জাম করতো না। আমাকে বেশ সম্মান করতো। ও যে উত্তরাতে আন্দোলন করছে আমি এটাও জানতাম না। তখন নিউজে দেখলাম উত্তরাতে অবস্থা খুব খারাপ। ক্যাম্পাসের জুনিয়র একজনকে কল দিলাম, সেও বললো উত্তরার অবস্থা অনেক খারাপ। আবার চিন্তায় পড়লাম। সাব্বিরের লাশ শেষ দেখা দেখতে যাওয়াও তখন সম্ভব ছিলো না। মনের মধ্যে কষ্টর সাথে রাগটাও বাড়লো। গত শীতের ছুটিতেও বাড়িতে গিয়ে একসাথে ডাব পেড়ে খেলাম! অথচ ও ছাত্রও না, আবার রাজনীতিও করে না। কিন্তু ওকে আজকে মরতে হলো। ফেসবুকে তখন লিস্টিং চলছে কোথায় কে মারা গেছে, সেখানে ওর নাম আর ছবি দিলাম । এরপর খোঁজ খবর নিতে লাগলাম কোথায় কি হচ্ছে, জানতে পারলাম মিরপুরে ব্যাপক গোলাগুলি হচ্ছে। সাময়িক বিজয়ের স্বাদ তখন বিষাদে পরিণত হলো। রাতে খাওয়া-ঘুম কিছুই ঠিক মতো হলো না।

ভোরের দিকে ঘুমাইলাম ঘুম ভাঙ্গলো অনেক দেরিতে। শুক্রবার (১৯ তারিখ) জুম্মার নামাজের পরে আপু ডাকাডাকি করে ঘুম থেকে তুললো। ঘুম ভেঙ্গেই গুলির শব্দ শুনি, আর চারদিকে হইচই। পুলিশ বনশ্রী আবাসিকে ঢুকে এলোপাতাড়ি গুলি করতেছে। জানতে পারলাম জুম্মার নামাজ শেষে বনশ্রী এ-ব্লকে মসজিদ থেকে মুসল্লিরা বের হচ্ছিলো, সেখানেও গুলি চালানো হয়েছে। ব্যালকনি দিয়ে নিচে তাকিয়ে দেখি এলাকার ছেলেপেলে লাঠিসোঁটা গোছাচ্ছে, ওখানেও একজনের পায়ে গুলি লেগেছে। তখন মাহতাব ভাই বাসায় আসে। এসে বলে, "আসিফ নিচে চল! পুলিশের এলোপাথারি গুলিতে ৬ বছরের বাচ্চাও মারা গেছে।" তখন নিজেকে আর ধরে রাখা গেল না। জুতা পরে নিচে নামতে লাগলাম, তখন আমার বন্ধু মোস্তফা

কামাল রিতু কল দিয়ে বললো, "বন্ধু আজ অফিস থেকে ছুটি নিছি, আন্দোলনে যাবো তোর সাথে।" ওকে জানালাম আমার বাসার নিচেই গুলি হচ্ছে। ও নন্দীপাড়া থাকতো, ও বললো ও আসতেছে।

> *ব্যালকনি দিয়ে নিচে তাকিয়ে দেখি এলাকার ছেলেপেলে লাঠিসোঁটা গোছাচ্ছে, ওখানেও একজনের পায়ে গুলি লেগেছে। তখন মাহতাব ভাই বাসায় আসে। এসে বলে, "আসিফ নিচে চল! পুলিশের এলোপাথারি গুলিতে ৬ বছরের বাচ্চাও মারা গেছে।" তখন নিজেকে আর ধরে রাখা গেল না।*

পুসহ আমরা নিচে নেমে দেখলাম, মানুষ কি করবে বুঝতে পারছে না। ১০/১১ জন লাঠি হাতে জি-ব্লকের সামনে বনশ্রী মেইন রোডে। তখন আগের দিনের কথা মাথায় আসলো যে যদি পুলিশের গাড়ি আটকাতে পারি তাহলে বেশি গুলি ক্যারি রতে পারবে না। কিভাবে আটকাবো ভাবতে ভাবতে দেখি রাস্তার পাশে অনেকগুলো বালির বস্তা রাখা। কোন কাজের জন্য হয়তো রেখেছিলো কেউ। আমি একা যেয়ে বস্তা তুলে রাখা শুরু করি আর মাহতাব ভাই লোকজন ডাকতে থাকে, যাতে প্রতিরোধ গড়ে তোলা যায়। আমার সাথে তখন আবাসিকের আরো কিছু ছেলে যোগ দেয়, আর কিছু দোকানদার তাদের দোকান থেকে কাঠের পুরনো আসবাপত্র এনে রাস্তায় আগুন জ্বালায়, যাতে টিয়ারশেল মারলে কাজে লাগে। তখন রিতু চলে আসে। রাস্তা মোটামুটি আটকে যায়। তখন প্রত্যেক বাসাবাড়ি থেকে লোকজন পানির বোতল, শুকনা খাবার আমাদের জন্য নিয়ে আসে। লোকজনের এমন অংশগ্রহণ আমি কখনো দেখি নাই। বাচ্চা থেকে বৃদ্ধ – আমাদের জন্য পানি, খাবার, লাইটার এগুলো এনে আমাদের দিতে লাগলো। তখন এফ ব্লক থেকে গুলির শব্দ পেলাম।

> *প্রত্যেক বাসাবাড়ি থেকে লোকজন পানির বোতল, শুকনা খাবার আমাদের জন্য নিয়ে আসে। লোকজনের এমন অংশগ্রহণ আমি কখনো দেখি নাই। বাচ্চা থেকে বৃদ্ধ – আমাদের জন্য পানি, খাবার, লাইটার এগুলো এনে আমাদের দিতে লাগলো। তখন এফ ব্লক থেকে গুলির শব্দ পেলাম।*

রাস্তায় দেখলাম পুলিশের গাড়ি আসতেছে আর বাকি পুলিশ হেটে আসতেছে গুলি করতে করতে। আমি ভেবেছিলাম প্রথমে হয়তো রাবার বুলেট, ছররা গুলি বা টিয়ারশেল মারবে। আমি আর রিতু সবার আগে এগিয়ে গিয়ে ইট মারি, কিন্তু ইট অতদূরে পৌঁছায় না। ঠিক সাথে সাথে ৩টা গুলি আমাদের গা ঘেঁষে বৈদ্যুতিক খাম্বাতে লাগে। আমি রিতুকে বলি ডিরেক্ট গুলি করছে, গলির মুখে ঢোকা। এত পরিমাণ গুলি যে ইট মেরে আটকানো সম্ভব না। মুহূর্তে আমাদের গলিতে মানুষে ভরে গেল। ছাত্র ছাত্রীরা অনেকে আইডি কার্ড পরে চলে এসেছে। সুযোগ না পেয়ে ভাবলাম যখন গলি পার হয়ে যখন যাবে, তখন পেছন থেকে

ইট মারবো। সবাই এক এক বাসার গ্যারেজে গিয়ে বসলাম। পুলিশ যাচ্ছে, আর বাসা বরারব, রাস্তা বরাবর এলোপাতাড়ি গুলি করছে।

১৯ জুলাই বনশ্রীর একটি ব্লক, ছবি: মাহতাব উদ্দীন আহমেদ

আমরা জানতাম এইচ ব্লকেও লোক আছে, পুলিশ ওদিকে ব্যস্ত হলে আমরা পিছন থেকে পাল্টা ধাওয়া দিতে যাব। যেমন ভাবা তেমন কাজ। পুলিশ গেল, আমরা পিছু পিছু দৌড় দিলাম, ২০ জনের মত ছিলাম, ওরা গুলি করতেছে সামনের ব্লকে। আর আমরা ওদের পিছন দিক দিয়ে যাচ্ছি। তখন মাহতাব ভাই কি ভেবে দাঁড়িয়ে গেল, বললো, "আসিফ যাইস না, ইটস এ ট্র্যাপ!" তার কথা শুনার সাথে সাথে দেখলাম এক এক জন করে মাটিতে পড়তে থাকলো গুলি খেয়ে। আমি আর রিতু দাঁড়িয়ে পড়লাম, দেখলাম একজনের আঙ্গুল ছিঁড়ে চলে গেল। একজনের পেটের এক সাইড দিয়ে গুলি লেগে আরেক সাইড দিয়ে বেড়িয়ে গেল। কিন্তু আমি ক্লিয়ার দেখলাম সামনের পুলিশগুলো গুলি করে নাই। আর তখনই আমার পাশে একটা ১২ বছরের বাচ্চা দৌঁড়িয়ে আসলো, আর ওর পেটের এক সাইড দিয়ে গুলি লেগে আরেক সাইড দিয়ে বেড়িয়ে গেল। ও আমার দিকে তাকিয়ে রাস্তায় পরে গেল। ওকে তোলারও সুযোগ পেলাম না। চিউ করে একটা শব্দ হয়, আর গুলি গা ঘেঁষে বেড়িয়ে যায়। আমি তখন বুঝলাম গুলিগুলো স্নাইপারের আর গুলিগুলো আসছিলো আফতাবনগর মানে রামপুরা খালের অপর পাশ থেকে। আমি আর রিতু বৈদ্যুতিক পিলারের পিছনে জায়গা নিলাম।

> *আর তখনই আমার পাশে একটা ১২ বছরের বাচ্চা দৌঁড়িয়ে আসলো, আর ওর পেটের এক সাইড দিয়ে গুলি লেগে আরেক সাইড দিয়ে বেড়িয়ে গেল। ও আমার দিকে তাকিয়ে*

> *রাস্তায় পরে গেল। ওকে তোলারও সুযোগ পেলাম না। চিউ করে একটা শব্দ হয়, আর গুলি গা ঘেঁষে বেড়িয়ে যায়।*

লি কমলে বের হয়ে আসলাম। তখন কয়েকজন মিলে বাচ্চাটাকে তুলে হাসপাতালে নিয়ে গেল, দেখলাম তখনো বাচ্চাটা চে আছে। মুহুর্তের মধ্যে শুধু জি ব্লক থেকেই প্রায় ৪০-৫০ জন গুলিবিদ্ধ লোককে নিয়ে যাওয়া হলো, ৫ জনকে দেখে মনে ল স্পট ডেড। তখন চিৎকার দিয়ে কাঁদতে ইচ্ছা হচ্ছিলো যে কিছুই করতে পারছি না! এত নিরীহ মানুষ মারা যাচ্ছে! অথচ র মধ্যে অধিকাংশ মানুষ আন্দোলনে সম্পৃক্ত ছিলো না। আমি শুধু এটাই ভাবছিলাম বনশ্রী আবাসিকের মতো শান্তি প্রিয় জায়গায় এমন হামলার কারণ কী? তখন পুলিশ ১০ তলার গলিতে, এই গলি থেকে অনেকে বলল, ওরা ১০ তলায় গিয়ে তিরোধ করবে। কিন্তু আমি বুঝতে পারছিলাম খালি হাতে গিয়ে অটোমেটিক গানের সামনে কিছুই করা সম্ভব না। নিজেদের অনেক অসহায় লাগতে লাগলো! পুলিশ আসে, গুলি করে, আমরা এক এক বাসার গ্যারেজে জায়গা নেই। আবার পুলিশ দূরে লে ইট মারি। এভাবে ২ ঘন্টা চলার পর পুলিশ এক প্রকার মানুষের চাপে আটকে পরে। তখন ভাবলাম এখন ওদের আটকায় ফেলতে পারবো। এত মানষের জীবনের মূল্য ওদের দিতে হবে! তখনই বিজিবির গাড়ি এসে ব্রাশ ফায়ার করতে তে সামনে আগায়, আর পুলিশসহ বের হয়ে যায়। বের হয়ে আরেক ব্লকে যায়, গুলি করে। আমরা যখন বাসার গ্যারেজে ঢুকি তখন বাসার গ্যারেজে এসে গুলি লাগে। বুঝলাম গলির ভেতরে ঢুকে গুলি করা হচ্ছে। এ সময় হঠাৎ শুনতে পাই আমাদের বাসার ৬ তলায় গুলি ঢুকছে। আমরা দৌড়ে ৬ তলায় উঠি কেউ হতাহত হলো কিনা দেখতে। গিয়ে দেখি ফ্ল্যাটের রান্নাঘরের জানালা দিয়ে দুইটা বুলেট ঢুকেছে, তখন রান্নাঘরে মানুষ না থাকায় কেউ হতাহত হয়নি।

ক্লান্ত শরীরে হতাশা আর রাগ নিয়ে বাসায় আসি। তখন মাহতাব ভাই বলে, “আজকে তোমার বাসার মালিক যেভাবে সাপোর্ট দিছে, পুলিশ এই বাসায় রেইড দিতে পারে।” বুঝতে পারি এমনিতে স্টুডেন্ট পেলেই অ্যারেস্ট করা হবে, অন্যদিকে অলরেডি জানতে পারি কলেজ ছাত্রলীগের লিস্টে সামনের দিকে-ই আমাদের নাম আছে। পুলিশ আমাদের খুঁজবেই। তখনই বাসা ছাড়ার ডিসিশন নেই। কিন্তু তখনো গোলাগুলি চলছে, রাস্তায় পুলিশ কিংবা লীগের লোকজন ধরলে রক্ষা নাই। তাই অনেক ঘুরিয়ে পেঁচিয়ে বাসা থেকে বের হই। রিতু ওর বাসায় যায়। আমি আর আপু মাহতাব ভাইয়ের বাসায় যাই। কিন্তু বনশ্রী থেকে বের হয়ে অবাক হলাম। বনশ্রী যখন পুরো যুদ্ধক্ষেত্র তখন সবুজবাগের দিকে পুরো ঠান্ডা। কেউ জানেই না, ওখানে কি হয়েছে। সরকার ১৭ তারিখই মোবাইল ডাটা অফ করে দিয়েছিল আর সবরকম নেট বন্ধ করে দিয়েছে ১৮ তারিখ সন্ধ্যাতেই, টেলিভিশনে এইসব গণহত্যার কোন খবর নেই। মাহতাব ভাইয়ের বাসায় পৌঁছে বিশ্রাম নেই। চাচাতো ভাইকে কল দিলাম, বললো মিরপুরের অবস্থা খারাপ, ১০ নাম্বারে হেলিকপ্টার থেকে গুলি চালিয়েছে, তার বিজনেস পার্টনারের শ্যালক পুলিশের গুলিতে মারা গেছে, তার লাশ আনতে সে হাসপাতালে গেছে। রাস্তায় এখনো গুলিবিদ্ধ অনেকে পড়ে আছে।

পরের দিন এনাম কল দিয়ে বলে, “সিম বন্ধ করে ফেল। ইউসুফ এরেস্ট হইছে, আমাদের গ্রুপের মেসেজ পুলিশের কাছে চলে গেছে।” জানতে পারলাম কামরুজ্জামান নামাজ পড়তে গেলে সেখান থেকে ছাত্রলীগের কিছু গুন্ডা, আমাদেরই ব্যাচমেট, লোকজনসহ ওকে তুলে নিয়ে গিয়ে সারা রাত ধরে টর্চার করেছে। এরপর ওকে থানায় পাঠায়। ইউসুফকে কল দিয়ে বলে ওকে প্রচুর মেরেছে, জামা কাপড় ছিঁড়ে ফেলেছে, ইউসুফ যেন কাপড় নিয়ে থানায় এসে ওকে বাঁচায়। কামরুজ্জামান ভালো

ছাত্র ছিলো, আন্দোলনেও যায় নাই, নিরীহ ছেলে, কিন্তু ওর সাথে এমন হয়েছে শুনে অনেক খারাপ লাগলো। ইউসুফ থানায় গেলে ইউসুফকেও অ্যারেস্ট করে।

বুঝলাম নাম্বার ট্র্যাক করতে পারে। বাড়িতে অত কিছু জানালাম না। বললাম বাসায় থাকা সেইফ না, আমি বাইরে আছি, সেইফ আছি। ফোন বন্ধ রাখতে হবে জানিয়ে ফোন বন্ধ করে ফেলি। এর মধ্যে আমার খোঁজ না পেয়ে অনেকে অনেক রকম থা ছড়ায়। তখন থেকে শুরু হয় যৌথবাহিনীর চিরুনী অভিযান। নতুন কেউ কারও বাসায় আসলে লীগ এসে কোপায় অথবা পুলিশ এসে ধরে নিয়ে যায়। অনেককে আবার গুলিও করে দেয়। একারণে পুরো ঘরবন্দি থাকি। এদিকে মিলিটারি নামিয়ে া কারফিউ দিয়ে দিলো। আমার তখন মাথায় একটাই চিন্তা ঘুরছিলো, আমি আমার গ্রামে যাবো। যদি মরতেই হয় গ্রামে মরবো। ঢাকার এই রাস্তায় পড়ে মরতে চাই না। ৭টা দিন বেসরকারি বাতাবি লেবুগুলোর নিউজ দেখে দিন কাটাই, আর রাগে লতে থাকি। এরপর কারফিউ একটু একটু করে শিথিল হতে থাকে। নেট ফিরে আসে।

মি চিন্তা করি ঢাকাতে এখন থাকা একদিকে যেমন ঝুঁকিপূর্ণ তেমনি অন্যদিকে আমি একা একা যোগাযোগ বিচ্ছিন্ন অবস্থায় ছু তো করতে পারবো না। পুলিশ থেকে বাঁচতে বৈষম্যবিরোধী ছাত্র আন্দোলনের গ্রুপ থেকেও লিভ নিলাম। ফেসবুকের পোস্টগুলো ডিলিট করি আর ভাবি গ্রামে যেয়ে ইসলামি বিশ্ববিদ্যালয়ের ছাত্রদের সাথে যোগ দিবো। ওখানে আমার অনেক ু আছে, লোকাল সাপোর্ট আছে, যেহেতু আমার বাড়ি ক্যাম্পাসের কাছে। আর ক্যাম্পাসের সমন্বয়কদের অনেকের সাথেই আমার ব্যাক্তিগত ভাবে পরিচয় আছে। ওখানে আমার ভালো গ্রহণযোগ্যতা আছে, বাড়ি যেয়ে আন্দোলন চালাব। বাসা থেকে অনেক দিক দিয়ে ঘুরে ঘুরে, কল্যাণপুর বাস কাউন্টার থেকে বাসে উঠে বাড়ির পথে রওনা দেই ২৬ জুলাই। মজার ব্যাপার হল, বাসের যাত্রীরা সবাই ভীত আর অধিকাংশই স্টুডেন্ট। কয়েকজনের সাথে কথা বলে বুঝতে পারি বেশির ভাগের অবস্থাই আমার মতো। তারা সবাই উপায় না পেয়ে গ্রামে ফিরছে। এক প্রকার হতাশও হই, আমরা সবাই গ্রামে ফিরলে ঢাকার আন্দোলনের কী হবে?

গ্রামে পৌঁছে এলাকার বন্ধুবান্ধব ভাই-ব্রাদারের সাথে দেখা। সবাই জানতে চাইলো এতদিন কই ছিলাম, কীভাবে ছিলাম, ঢাকার অবস্থা কী, হাসিনা কি আদৌ নামবে ক্ষমতা থেকে? সবাই উৎকণ্ঠার মধ্যে! ইবির আন্দোলনের একজন সহসমন্বয়কের সাথে কথা হলো। সে আমার কাছে লোকাল সাপোর্ট চাইলো যেন আমার এলাকার ছেলে মেয়ে ওদের সাথে জয়েন করে, আমি সবাইকেই বললাম। ঠিক করলাম পরদিন যাব, তখন আব্বু আমাকে ডেকে বলল, পুলিশ আব্বুকে সতর্ক করে দিয়েছে। এও বলেছে যে, তাদের কাছে খবর আছে আমি ঢাকাতে আন্দোলন করে গ্রামে ফিরেছি এবং ইবিতে আমি কোন প্ল্যান করছি এমন খবর ওরা পেয়েছে। সোজা কথায় থ্রেট। আব্বু স্থানীয়ভাবে বিএনপি-র রাজনীতি করে। যেটার সাথে আমার কোন সম্পর্ক ছিলো না, বিএনপি-র মতাদর্শের সাথে আমার মতাদর্শ যায় না। তবুও বিএনপি নেতার ছেলে হওয়াতে ছোট থেকেই অনেক ঝামেলার সম্মুখীন হয়েছি। এবারও ব্যতিক্রম হলো না। অনুমান করতে পারলাম, গ্রামের এক সেচ্ছাসেবক লীগ নেতা আমার নামে পুলিশকে ইনফর্ম করেছে। আর গোয়েন্দা বিভাগের লোক তো পেছনে ছিলোই।

বুঝলাম গ্রামে এসে আরো বড় বিপদে পড়েছি। নিজে ফিজিক্যালি আন্দোলনে যেতে পারতেছি না, বন্ধুবান্ধব অনেককে বললাম আমার অবস্থা। তোরা যেন ইবিতে যাস। ওরা বললো এটা আমাদেরও দায়িত্ব। ওরা ভালো রকম একটা সাপোর্ট দিলো। ইউনিয়নে ভালো গ্রহণযোগ্যতা থাকায় ইউনিয়ন ছাত্রলীগের নেতাদের গিয়ে বলে দিলাম যে যদি এই ইউনিয়নের কেউ গিয়ে ক্যাম্পাসের কোন স্টুডেন্টের ওপর হামলা করে তো আমিও চুপ করে ঘরে বসে থাকবো না, তাতে যা হয় হোক।

এতে কিছুটা কাজ হলো। আমার ইউনিয়ন থেকে থেকে খুব অল্প সংখ্যক লীগ ঝিনাইদহ শহরে আন্দোলনকারীদের ওপর হামলা চালাতে যায়। তবে ইসলামি বিশ্ববিদ্যালয়ে কেউ হামলা করতে সাহস পায় না। এভাবে একদিন আমরা আমাদের স্কুল ফিল্ডে বসে আছি, হটাৎ কিছু পুলিশ এসে জঘন্য ভাষায় আমাদের গালি গালাজ করতে থাকে, বলে স্কুলের ওপরে বাজারে কোন ছেলেপেলে থাকবে না, এরপর দেখলে পা ভেঙ্গে দেব, না হলে থানায় ধরে নিয়ে যাব। কারফিউ চলাকালীন ঢাকার আন্দোলন কিছুটা ফিকে হয়ে পড়লেই মনে হতো ঢাকায় ফিরে আন্দোলনে যুক্ত হওয়া দরকার, কিন্তু তখন দূরপাল্লার নবাহন বন্ধ থাকায় ফেরার পরিস্থিতিও ছিল না।

নবের মধ্য দিয়ে দিন যেতে লাগলো। গ্রামের লোকজন বারবার জিজ্ঞেস করতো হাসিনা পড়বে কি না। আমার উত্তর থাকতো, যত মানুষ মেরেছে ওকে ক্ষমতা থেকে নামতেই হবে। পরিচয় গোপন করে ইবিতে আন্দোলনে যেতাম। তবে ইবিতে টজ পরিমাণ লোকাল সাপোর্ট থাকায় লীগ, পুলিশ, বিজিবি কিছুই করতে পারেনি। আগস্টের ৪ তারিখ রাতে যখন লং র্চের ঘোষণা দিলো তখন আমি কনফিউজড হলাম যে বেশি তাড়াহুড়া করে ফেললো না? আর্মির কারফিউ দিয়েছে, এর ধ্য লং মার্চে যাবো কীভাবে? আমরা যারা ঢাকা ছেড়েছিলাম অনেকের কাছে কল দিলাম যে কীভাবে ঢাকা যাওয়া যায়। রা ঢাকার আশেপাশে ছিলো তারা যাবে বললো। আমি যোগাযোগ করে কোন গাড়ি পেলাম না যেটা ঢাকা যাবে, উপায় না য়ে ভাবলাম যা হবার হবে, ঢাকার মানুষই এখন ভরসা। সারা রাত টেনশন করলাম। অনেকে ভয় পাচ্ছিল, কালকে কি হতে চ্ছে কেউ জানতাম না। কত মানুষ মরবে ধারণা নাই।

৫ আগস্ট সকালে ঘুম ভাঙ্গার পর দেখি নেট বন্ধ হয়েছে, কোন খবর পাচ্ছি না। আমরা ইবিতে গেলাম সেখানে এত পরিমাণ জমায়েত হয়েছে যা হয়তো ইসলামি বিশ্ববিদ্যালয় আগে কখনো দেখে নাই। শেখপাড়া থেকে ক্যাম্পাস পর্যন্ত লোক। বিজিবি ভর্তি ৩টা গাড়ি আসলো, লোক দেখে হাত উঁচু করে চলে গেল। এরপর দুপুরের দিকে আমি খেতে বসেছি, এমন সময় আমার চাচাতো ভাই দৌড়াতে দৌড়াতে এসে আব্বুকে ডেকে বলে, “মেজোকাকা কাজ হয়ে গেছে! হাসিনা পদত্যাগ করেছে!” ঢাকা থেকে ফোন করে ছাত্রদলের কোন নেতা নাকি ওকে বলেছে। কিছুক্ষণ পরে টিভিতে আসলো সেনাপ্রধান জাতির উদ্দেশ্যে ভাষণ দিবে। কারো আর বুঝতে বাকি থাকলো না ঘটনা ঘটে গেছে। গ্রামের মোড়ে মোড়ে আনন্দ উৎসব লেগে গেল, যে যার মতো চিল্লাপাল্লা করছে। আর চোখের নিমিষে পুরো এলাকা আওয়ামীলীগ শুন্য হয়ে গেল। মুহুর্তে আমি রাস্তায় বেড়িয়ে পড়লাম, হাইওয়েতে গিয়ে দেখলাম লোকে লোকারণ্য। হাতে দা বটি, লাঠি যে যা পেরেছে নিয়ে এসেছে। সবার মুখে তখন এক কথা – “লীগ এতদিন বহুত জ্বালাইছে এখন গেল কই!”

অবশেষে আমরা জিতলাম। এদেশের জনগণ জিতল।

আসিফ রহমান: ২০২৪ এর গণঅভ্যুত্থানের একজন প্রত্যক্ষ ও সক্রিয় অংশগ্রহণকারী শিক্ষার্থী।

Social Share

Share 112 Post

Search here..